না-মঞ্জুর গল্প

অমল দাশগুপ্ত

একটা গল্প চাই, পলিটিক্যাল।

অপরেশ নিজেকেই বলল কথাটা। সম্পাদক তার বিশেষ বন্ধু। বন্ধুত্বের দাবীতে অনেক সময়েই ফরমায়েশী গল্পের বরাত আসে। এবারেও এসেছে। কিন্তু এবারে সে খুশি। কেননা তার ধারণা, সাম্প্রতিক জীবন নিয়ে গল্প লিখতে হলে রাজনীতি আসবেই, খোলা- খুলিভাবে। নিজে মোটামুটি রাজনৈতিক জীবন কাটিয়ে এসেছে মনের ইচ্ছার মিল ঘটেছে বলেই সে খুশী। রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় একটা ধমক দেবার মতো করে কথাটা বারবার নিজেকে শুনিয়ে রাখছে।

জীবনের স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো কী বলে? কোনো একটি দিন? কোনো একজন মানুষ? কোনো একটি ঘটনা? গল্পের একটা অবলম্বন চাই তো।

দিনই যদি ধরতে হয় তাহলে অবশ্যই ২৩শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন কলকাতার রাস্তায় যে-দৃশ্য দেখেছিলাম তা ভোলবার নয়। দুপুরেই খবর পাওয়া গিয়েছিল অতুল্য ঘোষ হেরেছে। সন্ধ্যেয় খবর পাওয়া গেল, প্রফুল্ল সেনও। সঙ্গে সঙ্গে সারা কলকাতায় একটা উল্লাসের সমুদ্র বান ডেকে গেল যেন। এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টেও নয়। চারিদিকে বোমা ফাটছে, রংমশাল জ্বলছে, হাত ধরাধরি করে লোক নাচছে। ছেলে- বুড়োয় ভেদ নেই। সবাই খুশী, সবাই সবার দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেকটি থামে, প্রতেকটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে কাঁচকলা আর বেগুন ঝুলতে লাগল। কোথাও কোথাও একটা ঝাঁটা। অজস্র মিছিল বেরিয়েছে। ট্রামে বাসে লোক নেই। সকলেই রাস্তায় মুক্তির আনন্দে সবাই আত্মহারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল খাটিযার দুটি কুশপুত্তলিকা শুইয়ে রেখে শ্মশানযাত্রীর দল। হরিধ্বনি উঠছে। তারপরে মহা সমারোহে রাস্তার মাঝখানেই কুশপুত্তলিকার দাহকার্য শুরু হয়ে গেল। কোথও কোথাও রাস্তার আলোর লাল কাগজ লাগানো। অর্থাৎ বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে শহরটা এখন লাল। রাস্তার কোথাও পুলিশ নেই। ভিড়ের জন্যে অনেক রুটেই ট্রাম বন্ধ। বাস অনেক ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু কারও মুখে কোনো বিরক্তি নেই। দুটো রাহু দেশের ওপর ভর করে ছিল। একদিনে মুক্তি!

কলেজস্ট্রীটের মোড়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল পুতুলদির সঙ্গে।

এই যে অপু, বড়ো মিছিলটা কোন্ দিকে গিয়েছে বলতে পারিস্? বড়ো মিছিল! সব দিকেই তো মিছিল পুতুলদি।

আমি যে শুনলাম, মস্ত একটা মিছিল বেরিয়েছে। আমি সেই মিছিলটাতে যেতে চাই। পুতুলদি, তাকিয়ে দেখ, কোনো মিছিলই ছোট নয়

পুতুলদির মুখে তবু একই কথা: কিন্তু আমি যে শুনে এলাম মস্ত একটা মিছিল বেরিয়েছে। সেই মিছিলটার সঙ্গে যাব বলেই তো এতদূরে ছুটে এলাম।

চলো পুতুলদি, মিছিলটা খুঁজে বার করি।

যাবি অপু! খুব মজা হবে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে রে।

চলো যাই।

সে এক আশ্চর্য সন্ধ্যা গিয়েছে। অপরেশের চোখের সামনে একটা মেলার মতো দৃশ্য ফুটে উঠল। আলো, বাজি আর মানুষ। মানুষ বাজি আর আলো। কোন্‌টা যে মিছিল আর কোন্‌টা যে আলো আলাদা মানুষের ভিড় বোঝার উপায় নেই।

চলো এই মিছিলটাতেই যাই পুতুলদি।

কিন্তু আমি যে শুনে এলাম মস্ত একটা মিছিল বেরিয়েছে।

এই তো মস্ত মিছিল।

পুতুলদি যেন এখন আর পুতুলদি নন। ফ্রকপরা, বেণীদোলানো অবুঝ আদুরে মেয়ের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, কই বাজনা তো নেই! চল অপু, সেই মিছিলটাকেই খুঁজে বার করি। সেই মিছিলটার সঙ্গে বাজনা আছে।

চলো।

সেদিন আমরা অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিলাম। অনেক মিছিল, অনেক আলো, অনেক বাজনা। কিন্তু পুতুলদি তবুও বলেন, না অপু, এটা নয়, চল সেই মিছিলটা খুঁজে বার করি।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে পিছনে তাকিয়ে আমি বলে উঠেছিলাম, পুতুলদি, দেখ দেখ, এই তো মিছিল। আমরাই তো মিছিল হয়ে উঠেছি।

সত্যিই মিছিল। পিছনের যতোদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। আলোর মালার মতো। গানের সুরের মতো। পুতুলদি তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেছিলেন, তাই তো!

অপরেশ মনে মনে ভাবতে লাগল, এই তো, এই একটি দিন, এই একটি সন্ধ্যা, কয়েকটি ঘন্টার এই উত্তরণ যদি আমি ফুটিয়ে তুলতে পারি— তাহলেই তো গল্প। পুতুলদি প্রতীক। অসুস্থ স্বামী ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপর্যস্ত এক সংসারের হাল ধরে থাকা পুতুলদি। আর মিছিলের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোটা হবে নতুন প্রভাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা। অনেক অন্ধকার ঠেলে ঠেলে পুতুলদি এগিয়ে চলেছেন। এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হল।

পুতুলদিই সেদিন ছিলেন সমুদ্রপারের নতুন প্রভাতের দেশ

ঘুরতে ঘুরতে পুতুলদি এক সময়ে বলেছিলেন, অপু, আজ আমার সঙ্গে চল।

তোমারই সঙ্গেই তো আছি পুতুলদি।

আমাদের বাড়িতে।

চারদিকে আলো, গান আর বাজনা। শহরের সমস্ত মানুষ বোধ হয় রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। আজকের দিনটি যে এমন হবে তা কি আগে থেকেই সবাই জানত? তাই কি বাজি তৈরী করে রেখেছিল? তাই কি এমন দীপান্বিতার উৎসব? আজকের এই ঝলমলে সন্ধ্যার পরে আবার রাত্রির অন্ধকার নামে তাই কি সমস্ত মানুষ এমন রুখে দাঁড়িয়েছে? তাই কি এতো আলো, এতো গান আর বাজনা?

আমি হিসেব করতে ভুলে গেলাম যে পুতুলদির বাড়িতে যেতে হলে এখন শেয়ালদা সাউথ স্টেশন থেকে লোক্যাল ট্রেনে চাপতে হবে। প্রায় চল্লিশ মিনিটের হাঁটা - পথ। তারপর সম্ভবত আর ফিরে আসা কোনো পথ খোলা থাকবে না।

চলো যাই,

পুতুলদি বললেন, কিছু খাবি অপু? খিদে পায় নি?

আমি বলছিলাম, খিদে পায়নি। আমার খেতে ইচ্ছে করছে আনন্দে। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে পুতুলদি? তুমি তো অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এসেছ।

না, খিদে তো পায়নি!

কিন্তু পাওয়া উচিত ছিল। তুমি তো সেই কোন কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছ।

পুতুলদি ছোট মেয়ের মতো মাথা ঝাঁকালেন, না, আমার খিদে পায়নি। তবু খাব।

একটা দোকানে ঢুকে আমরা চা আর কেক খেলাম। চায়ে চুমুক দিতে দিতে পুতুলদি অনর্গল কথা বলতে লাগলেন। জানিস অপু, অনেক দিন পরে আজ আমি খিদের চিন্তা থেকে মুক্ত হলাম। এ - কত বড়ো মুক্তি তা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম বলতে গেলে। নইলে ভাব একবাব, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ভাবতে বসি, বাড়ির মানুষগুলোকে কী খাওয়াব। নিজে কী খাব। আপিসে এসে কাজ করি আর ভাবি, কী খাই কী খাই! হাসিস নে অপু। গত এক বছরে খাওয়ার চিন্তা আর খাওয়াবার চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভেবেছি বলে তো মনেই পড়ে না। কারণে অকারণে ছেলেমেয়েদের ধমক দিয়েছি, স্বামীর ওপর রাগ করেছি— বলতে গেলে সবই এই খাওয়ার জন্যে। বাইরে বেরোলে বিশ্বসুদ্ধ লোকের ওপর রাগ হত। হাসির কথায় হাসতে পারতাম না। কাউকে হাসতে দেখলে ভাবতাম, কি বিশ্রী। সবই এই খাওয়ার চিন্তার জন্যে। তুই শুনলে অবাক হবি অপু, দোকানের শো-কেসে ভালো ভালো খাবার সাজানো আছে দেখলেও আমার কেমন মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। তোর দাদা রাত্তিরবেলা পাঁউরুটি আর দুধ খান। একদিন শুধু বলেছিলেন, পাঁউরুটিতে কেমন যেন গন্ধ উঠেছিল, তুমি তো তাই ভাব। আমি তোমাকে সস্তাদরের পচা পাঁউরুটি খাওয়াচ্ছি।

এসব কথা আর থাক পুতুলদি।

না, শোন, পুতুলদি হাসলেন, একদিন হয়েছে, কি, ডালে বোধ হয় বার তিনেক নুন দিয়ে ফেলেছিলাম। একেবারে নুনকাটা ডাল, মুখে দেওয়াই যায় না। ছেলেমেয়েরা কিন্তু নিঃশব্দে খেয়ে উঠল। পরে আমি খেতে গিয়ে টের পেলাম। তখন আমি কী করলাম বল তো?

পুতুলদি যেন আমাকে ধাঁধার জবাব জিজ্ঞেস করছেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, আবার নতুন করে ডাল রান্না করলে।

উঁহু। পুতুলদি মুখ টিপে হাসলেন, আমি তিনজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললাম, তোরা কি সব শুয়োর হয়েছিস। জিভের স্বাদ বলে কিছুই নেই। ডালে নুন বেশী হয়েছে তারও টের পাস না।

ওরা কি বলল?

সব চোর পড়ার মতো চুপ করে রইল।

তখন আমার খেয়াল হয়েছিল ঃ আচ্ছা পুতুলদি তুমিকি রাত্তিরের রান্না সেরে এসেছ?

না

ফিরে গিয়ে রান্না করবে?

আজ করব। দিদির হাতের রান্না না খাইয়ে ছাড়ব কেন?

অন্যদিন ফিরে গিয়ে রান্না করো না?

পুতুলদি অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন ন্নাঃ।

সকালের রান্না থাকে বুঝি?

পুতুলদি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল যাই।

বাইরে বেরিয়ে আমি প্রস্তাবটা করলাম : পুতুলাদি, পাঞ্জাবির দোকানের রুটি আর কষা-মাংস কিনে নিয়ে যাই, কি বলো?

পুতুলদি এক্ষত্রে স্পষ্ট একটা ধমক দিলেন : না। তুই ভাবছিস আমার বাড়িতে বুঝি সবই বাড়ন্ত। কি করে ভাবলি বল তো! চালও আছে ডালও আছে, দিদির হাতের খিচুড়ি, পাঞ্জাবীর দোকানের রুটি আর কষা-মাংসের চেয়ে খারাপ হবে না বলতে পারি। একটা পান খাব, দাঁড়া।

দাঁড়াব কি, মানুষের স্রোত চারদিক থেকে ঠেলছে। বয়ার মতো একটা কিছু অবলম্বন করতে না পারলে এখানে দাঁড়ানো শক্ত। চায়ের দোকানে পাশ দিয়ে সরু একটি গলি বেরিয়েছে সেখানে গিয়ে একটু আশ্রয় পাওয়া গেল।

পুতুলদি বললেন, জর্দা দিয়ে, মিষ্টি দিয়ে এলাচ দিয়ে, আর যা - কিছু মশলা আছে সব দিয়ে দুটো পান দাও তো।

পিপারমেন্ট দেব দিদি?

পুতুলদি উদার গলায় বললেন, সব, সব।

এখানে নতুন এক দৃশ্য দেখা গেল! সঙের মিছিল। পর পর চারটি রিকশা। নির্বচনে পরাজিত কংগ্রেসী নেতাদের সা-

পোশাকে এক - একটি রিকশাতে এক একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে। সকলকেই পিছন থেকে বড়ো বড়ো পাখা দিয়ে হাওয়া করা হচ্ছে। সামনের দিকে রীতিমতো খোল - করতালসহ হরি-সংকীর্তনের দল। খই ছেটানো হচ্ছে। দেখতে দেখতে চারদিকের বারান্দায় আর ছাতে পর্যন্ত ভিড় জমে গেল।

পুতুলদি বললেন, লজ্জা কি অপু, ধরিয়ে ফেল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি বললাম, এবার চল যাই পুতুলদি।

পুতুলদির সামনে সেই প্রথম আমি সিগারেট খাই।

ভাবতে ভাবতে অপরেশ একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আজকাল আর তার পকেটে সিগারেট থাকে না। খুব ইচ্ছে হলে একটি করে কেনে। সেদিন যে ব্রাণ্ডটি খেত তার একটির দাম ছিল পাঁচ পয়সা এখন হয়েছে আট পয়সা। বাধ্য হয়ে আরও নিচুতে নামতে হয়েছে। পুতুলদির কথা ভাবতে ভাবতে আজ একটি সিগারেটের জন্যে পুরো আট পয়সাই খরচ করে ফেলল।

শেয়ালদা স্টেশনে এসে পুতুলদি বললেন, অপু, তুই দাঁড়া। মেয়েদের কাউন্টারে ভিড় কম। আমি তোর জন্যে একটা টিকিট কেটে আমি।

আমি বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্টেশনেও প্রচুর ভিড়। দলে দলে আরো আসছে। যারা বিকেলের বা সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে যায় তারাও আজ দেরি করে ফিরছে বোঝা গেল। কোনো একটা উৎসবের শেষে বাড়ি ফেরার মতো সুখী ও ক্লান্ত চেহারা। আকাশ দিয়ে একটা ফানুস উড়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে একটি ছেলে তার বাবাকে বলল, বাবা, ছেড়ে দিই? বাবা বললেন, দে। ছেলেটি দিল। গ্যাস - বেলুনটি কিন্তু খানিকটা উঠেই মিলিয়ে গেল আকাশের অন্ধকারে। ফানুসের আগুন কোথায় পাবে সে!

তারপরের দৃশ্যটি অপরেশ চোখ বুঝলেও স্পষ্ট দেখতে পায়।

জোয়ান তাগড়া চেহারা মানুষটার। মেরুদণ্ডকে বেঁকিয়ে সামনের দিকে অনেকখানি নুয়ে পড়েছে। কোলে বাচ্চা। হাউহাউ করে কাঁদছে আর আর বলছে, বাবু গো বাবু, মরে গেলুম, বাবু গো বাবু দুটো পয়সা দিন।

চিকণ মসৃণ গায়ের চামড়া দেখে বোঝা যায়, সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। চোখ দুটি কোটরে ঢোকা, গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো শহরে রুক্ষতার ছাপ পড়েনি।

বাবু গো বাবু! বাবু গো বাবু!

হাউহাউ করে কাঁদছে আর হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে আরো একদল মানুষকে দেকাচ্ছে। আরো তিনটি বাচ্চা ও একজন স্ত্রীলোক। নিঃসাড় হয়ে শুয়ে। তবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়নি বোঝা যায়। এখনো বেঁচে।

বাবু গো বুবু! বাবু গো বাবু!

জোয়ান তাগড়া একটা লোক হাউহাউ করে কাঁদছে —এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না। ভিখিরীদের যে ট্রেনিংটুকু থাকে, এদের তা-ও নেই!

পুতুলদি তখনো লাইনে দাঁড়িয়ে। অপরেশ গিয়ে বলেছিল, পুতুলদি আজ থাক। পরে একদিন যাব। পুতুলদি শুধু বলেছিলেন, আচ্ছ।

সিগারেটটা বিস্বাদ লাগছে। আট পয়সা দামের সিগারেট এখনো অর্ধেক শেষ হয়নি। তবুও সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অপরেশ হনহন করে হাঁটতে লাগল।

এই পুতুলদিকে নিয়ে গল্প লিখব আমি। ফ্রেব্রুআরির সেই দিনটির পরে পুতুলদির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তারপরে শেষ দিনগুলো গিয়েছে তার মধ্যে পুতুলদিও নিশ্চয়ই পলিটিক্যাল রিঅ্যাক্ট করেছেন। সেটুকু আমাকে জানতে হবে। তেইশে ফেব্রুয়ারির উত্তাল তরঙ্গটি তখন অনায়াসেই রাজনীতির বেলাভূমিতে আছড়ে পড়তে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে অপরেশ গিয়ে হাজির হল একেবারে পুতুলদির অপিসে। তখনো চারটে বাজেনি। পুতুলদি নিশ্চয়ই আফিসে আছে। কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, পুতুলদি আগে চলে গিয়েছেন। না, বাড়িতে নয়। রুটির লাইনে। একটু আগে গিয়ে না দাঁড়ালে নাকি রুটি পাওয়া যায় না।

বেশী দূরে নয়। সেই রুটির লাইনেরও খোঁজ পাওয়া গেল। পৃথক দুটি জানালায় পুরুষদের ও মেয়েদের পৃথক লাইন। চারটেও বাজেনি, আপিস ছুটি হতেদেরি আছে, এরই মধ্যে পুরুষদের লাইন আট- বগির লোক্যাল ট্রেনের চেয়ে লম্বা। মেয়েদের লাইন তার চেয়ে একটু ছোট।

পুতুলদিই দুর থেকে ডাকলেন, অপু, অপু।

সামনে যেতেই বললেন, ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? লাইনে দাঁড়া।

লাইনে দাঁড়ালে কিন্তু কিছুতেই রুটি পাবিনে।

আমি তো রুটি কিনতে আসিনি, পুতুলদি।

তবে?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

পুতুলদি বললেন, তাহলেও তো অপেক্ষা করতেই হবে। তার চেয়ে বরং লাইনে গিয়ে দাঁড়া না! তোর দরকার না থাকে, আরো একটা রুটি পেলে আমার সুবিধে হয়।

পুতুলদি আগেই পেয়ে গেলেন। অপরেশের জন্য তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। অপরেশ বেরিয়ে আসতে পুতুলদি বললেন, তোর সত্যিই দরকার নেই তো, তাহলে আমিই নিলাম।

আচ্ছা।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, পান খাবে পুতুলদি?

না।

কেন আছ পুতুলদি?

দেখতেই পাচ্ছিস।

দু-পাউন্ড রুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছ, কিন্তু তো খারাপ মনে হচ্ছে না। অপরেশ কথার মধ্যে একটু ঠাট্টার সুর আনতে চেষ্টা করল।

আচ্ছা অপু, এক পাউন্ড রুটি থেকে কটা শ্লাইজ বেরোয় বলতে পার? পুতুলদি যেন ধাঁধার জবাব জানতে চাইছেন।

অপরেশ সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, আমি জানি না পুতুলদি।

তবে শোন। চামড়ার চেয়ে একট পুরু করে যদি কাটিস তো পনেরোটা। আঙ্গুলের চেয়ে একটু সরু করে যদি কাট তো বারোটা। এবার হিসেব করো।

কী হিসেব করব?

তোমার দাদাকে চার টুকরো দিতে হয়। বাকি থাকে আট। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমার তিনটি ছেলেনেয়ে এখনো বেঁচে আছে। আমাকে নিয়ে তাহলে হল গিয়ে চার। মাথাপিছু দুই।

অপরেশ জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কেন, রাত্তিরে তোমরা পাঁউরুটি খাও কেন?

তার আগেই একটি লোক এসে একবারে সামনে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে কিছু খেতে দেবেন?

হাউহাউ কান্না নয়, ভিখিরীর মতো কাকুতিমিনতি নয়, প্রায় একটা ইচ্ছা জানাবার মতো।

যাও, যাও, ভাগো। অপরেশ বিরক্ত।

আমি কিছু খেতে চাই। লোকটির চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে।

ধর তোর একটু। বলে হাতের রুটিটা অপরেশের হাতে দিয়ে পুতুলদি ব্যাগ খুললেন।

চোখের পলকে রুটিটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লোকটা দৌড়তে শুরু করল। দৌড়তে লাগল। দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সম্পাদক পড়ে বললেন, কিন্তু এ-গল্পে পলিটিক্স কোথা?